প্রথম আলো

তারিখ 12 OCT 2013
পৃঃ ১২ কলাম ৭

আজ-কাল-পরশু ■ মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর

বিশ্ববিদ্যালয় আইনের সংশোধন চাই

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তি স্থাপনের সম্ভাবনা দেখা দিতে না-দিতেই আবার গোলমাল। এবারের গোলমাল আরও মারাত্মক। উপাচার্য-শিক্ষক ধাক্কাধাক্কি। আন্দোলনরত শিক্ষকদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা। শিক্ষক সমিতির লাগাতার ধর্মঘটের হুমকি। (সূত্র: *সংবাদপত্র*, ১০ অক্টোবর) মনে হচ্ছে, জাহাঙ্গীরনগরের পরিস্থিতি সহজে মীমাংসা হবে না।

এর আগে ধর্মঘটী শিক্ষকদের সঙ্গে শিক্ষাসচিবের বৈঠক সফল হয়েছে। (৮ অক্টোবর) বেশ কিছু শর্ত সাপেক্ষে শিক্ষকদের একটি গ্রুপ আন্দোলন প্রত্যাহার করতে সম্মত হয়। ওদিকে নয় দিন অবরুদ্ধ থাকার পর রেজিস্ট্রার ও ডেপুটি রেজিস্ট্রারও অবরোধমুক্ত হয়েছেন। (৮ অক্টোবর) আশা করা যায়, ঈদের পর খুললে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক শিক্ষার পরিবেশ পুনঃস্থাপিত হবে।

পরিবেশ স্বাভাবিক হলেও আন্দোলনের সময়ের ঘটনাবলি ভুলে যাওয়া উচিত হবে না। শুধু তা-ই নয়, এ ব্যাপারে দোষী শিক্ষকদের বিচার করে শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত। তা না হলে ভবিষ্যতে আবার একই ঘটনা ঘটতে পারে। কেউ শাস্তি না পেলে অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েও এ রকম ঘটনা ঘটতে পারে।

দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মাঝেমধ্যেই নানা সংকট দেখা যাচ্ছে। এগুলো বিচ্ছিন্নভাবে কেইস টু কেইস সমাধান করা কতটা যৌক্তিক হচ্ছে এ ব্যাপারে আমার মনে সন্দেহ আছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল সমস্যা এর আইনের দুর্বলতা। এই আইনের সুযোগ নিয়েই শিক্ষকেরা অত্যধিক দলীয় রাজনীতিতে মত্ত হয়েছেন। অনেকে কোনো নিয়মনীতিও মানতে চাইছেন না। বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে (কমবেশি) দেশের দূষিত দলীয় রাজনীতির প্রভাব পরিবেশকে ক্ষুণ্ন করেছে। এ ব্যাপারে ইউজিসি বা শিক্ষা মন্ত্রণালয় কোনো ভূমিকা পালন করেনি। হয়তো 'বিশ্ববিদ্যালয় আইন' তাদেরও কাজ করতে দিচ্ছে না। কাজেই আপাতত মন্ত্রী-সচিব পর্যায়ে বৈঠক করে জাহাঙ্গীরনগরের সমস্যার সমাধান করলেও তাতে মূল সমস্যার সমাধান হবে না। অন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকেরা (একটি দলকানা গ্রুপ) অন্য রকম সংকট তৈরি করতে পারে। কাজেই সমস্যার মূলে গিয়ে সমাধান খুঁজতে হবে। আমরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা করি না। সরকার বেশির ভাগ সময় উদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দিতেই ব্যস্ত হয়।

প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য আইন রয়েছে। বিস্ময়ের ব্যাপার, সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় অভিন্ন একটি আইনে পরিচালিত হচ্ছে না। বহুল আলোচিত '৭৩-এর অর্ডিন্যান্স' নিয়ে এ যাবৎ কোনো পর্যালোচনা বা সংশোধন হয়নি। আমাদের জাতীয় সংবিধান পর্যন্ত ১৫ বার সংশোধন করা হয়েছে। ৭৩-এর অর্ডিন্যান্স কি এতই উঁচু মাপের বিশুদ্ধ আইন যে তা কখনো সংশোধনের প্রয়োজন হয়নি? এই আইনসহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পর্যালোচনা ও সময়োপযোগী করে সংশোধন ও সংযোজন করার লক্ষ্যে একটি কমিশন গঠন করার জন্য আমরা প্রস্তাব করছি। এটা সময়ের দাবি। আরও অনেক আগেই ৭৩-এর আইন পর্যালোচনা করা উচিত ছিল। এ ব্যাপারে কোনো মহলই সোচ্চার হয়নি। প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি অভিন্ন আইন হওয়া উচিত।

৭৩-এর আইন ও অন্যান্য আইন পর্যালোচনা করার সময় কয়েকটা বিষয় বিশেষ বিবেচনা করা দরকার। ১) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মনোনয়ন/ নির্বাচনপদ্ধতি নিয়ে দলীয় রাজনীতি করার যেন সুযোগ না থাকে। উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যের জন্য শিক্ষকতার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও অত্যন্ত উঁচু একাডেমিক রেকর্ড ও প্রকাশনার শর্ত থাকা দরকার। এ রকম শর্ত থাকলে নিছক দলকানা ক্যাডার শিক্ষকেরা উপাচার্য হতে পারবেন না। ২) ডিন ও অভ্যন্তরীণ নানা নির্বাচনের আধিক্য যেন কমানো যায়, ৩) লেকচারার পদে তরুণ শিক্ষকদের নিয়োগ দান পদ্ধতি যেন দলীয় পক্ষপাতমুক্ত রাখা যায় তার ব্যবস্থা রাখা। যদিও জানি, এসব কাজ পক্ষপাতমুক্ত রাখা খুবই কঠিন। কিন্তু গত ৪০ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে এসব বিধিই এমনভাবে করতে হবে, যাতে একাডেমিকভাবে অযোগ্য দলীয় ক্যাডাররা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক পদে কোনোভাবেই স্থান না পায়। একাডেমিকভাবে দুর্বল দলীয় শিক্ষক ক্যাডাররা যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য ও অন্যান্য একাডেমিক পদে স্থান পান, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক চর্চা, প্রকাশনা, গবেষণা ও মানসম্পন্ন শিক্ষকতা নিরুৎসাহিত হবে। সত্যিকার গবেষক-শিক্ষকেরা হতাশ হয়ে যাবেন। অনেকে লেখাপড়া ও গবেষণা না করে শুধু দলবাজিতে নিয়োজিত হবেন। দলবাজি করলেই যদি সরকার নানা পদ দিয়ে পুরস্কৃত করে, তাহলে গবেষণা ও প্রকাশনার দরকার কী?

> বিশ্ববিদ্যালয় আইনে 'শিক্ষক রাজনীতি' নিয়েও পর্যালোচনা করা দরকার। শিক্ষকেরা রাজনৈতিক দলের কর্মীর মতো আচরণ করবেন, তা প্রত্যাশিত নয়। শিক্ষক রাজনীতির একটা সীমা থাকা দরকার। জাহাঙ্গীরনগরে এখন যা হচ্ছে তা কি শিক্ষক রাজনীতি? নাকি শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন?

বিশ্ববিদ্যালয় আইনে 'শিক্ষক রাজনীতি' নিয়েও পর্যালোচনা করা দরকার। শিক্ষকেরা রাজনৈতিক দলের কর্মীর মতো আচরণ করবেন, তা প্রত্যাশিত নয়। শিক্ষক রাজনীতির একটা সীমা থাকা দরকার। জাহাঙ্গীরনগরে এখন যা হচ্ছে তা কি শিক্ষক রাজনীতি? নাকি শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন?

জাহাঙ্গীরনগরের ঘটনাবলি সামনে রেখে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পর্যালোচনা করে সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি অভিন্ন আইন করার জন্য আমরা প্রস্তাব করছি। এ ব্যাপারে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দলীয় শিক্ষকেরা সংবাদপত্রে মতামত দিলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটা বাস্তব চিত্র পেতে পারে।

জাহাঙ্গীরনগর ইস্যুতে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও জনপ্রিয় লেখক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের 'এই লজ্জা কোথায় রাখি?' (*ইত্তেফাক*, ৩০ আগস্ট) শীর্ষক নিবন্ধটির বক্তব্যকে আমি সমর্থন করছি। ড. ইকবাল আলোচ্য ঘটনার শুধু একটি বিষয়ের ওপর ফোকাস করেছেন। তা হলো, 'ভিসি' মহোদয়ের বিরুদ্ধে জাবির শিক্ষকদের একটি গ্রুপ কিছু অভিযোগ তুলেছেন এবং অভিযোগের প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা ভিসি মহোদয়কে তাঁর অফিসকক্ষে একনাগাড়ে কয়েক দিন অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন। ড. ইকবাল আন্দোলনরত শিক্ষকদের ছেলেমেয়েদের কাছে 'ভিসিকে আটকে রাখার যে গল্প' বলার জন্য প্রস্তাব করেছেন তা অভিনব। আমি আশা করব কোনো কোনো শিক্ষক ইতিমধ্যে তা করেছেন। তাঁদের ছেলেমেয়েরা এই 'গল্প' শুনে কী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে তা পত্রিকার মাধ্যমে শিক্ষকেরা জানালে পাঠকেরা একটা নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করবেন।

জাবির ভিসি ড. আনোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে শিক্ষকদের একটি গ্রুপ যে অভিযোগ করেছে, তা হয়তো ১০০ ভাগ সত্য অথবা এক ভাগও সত্য নয়। সেটা দেখা নাগরিক হিসেবে আমার দায়িত্ব নয়। সেটা দেখবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউজিসি বা আদালত। বিক্ষুব্ধ শিক্ষকেরা ভিসির ওপরমহলের কাছে তথ্য-প্রমাণসহ সব অভিযোগ দাখিল করতে পারতেন। সেই পথ সব সময় খোলা ছিল। সেটাই সভ্য সমাজের নিয়ম। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নিশ্চয় ভিসি মহোদয়ের বিচার করত। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে ভিসির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের না করে শিক্ষকদের একটি গ্রুপ ভিসি মহোদয়কে তাঁর অফিসে লাগাতার কয়েকটি দিন অবরুদ্ধ করে রাখা রীতিমতো সন্ত্রাসী কাজ; এটা শুধু শিক্ষকসুলভ নয়, এটা কোনো সভ্য, শিক্ষিত ও দায়িত্বশীল ব্যক্তির আচরণ হতে পারে না। এই জঘন্য আচরণের জন্য আন্দোলনরত সব শিক্ষকের লজ্জিত হওয়া উচিত। তাঁরা ভিসি মহোদয়ের বিচারের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন এবং বিচারের আগেই ভিসি মহোদয়কে একধরনের শাস্তি দিয়েছেন, যা অগ্রহণযোগ্য, অনভিপ্রেত ও অত্যন্ত নিন্দনীয়। শিক্ষকদের (একটি গ্রুপ) এই আচরণ জাবির ছাত্র, দেশের অন্য ছাত্র ও শিক্ষকদের কাছে একটা ভুল বার্তা দিয়েছে। এই ভুল বার্তায় অনেক শিক্ষক ও ছাত্র অনুপ্রাণিত হতে পারেন।

এ ধরনের ঘটনা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে এ রকম সন্ত্রাসী ঘটনা আর না ঘটে, সে জন্য ইউজিসি বা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচিত জাবির আন্দোলনরত শিক্ষকদের শুধু এই একটি অ্যাকশনের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া। ইতিমধ্যে রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়েও এমন ঘটনা ঘটেছে। সবারই শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করার অধিকার রয়েছে। তবে আন্দোলনের নামে ভিসি মহোদয়কে অবরুদ্ধ করে রাখা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই অপরাধের যদি শাস্তি না হয়, তাহলে আরেক দিন ছাত্ররাও এই দুঃসাহস দেখাতে পারেন। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়েও এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগের নিষ্পত্তি করার পথ এটা নয়। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই নানা অভিযোগ রয়েছে। তা নিরসনের জন্য কোনো পক্ষের সন্ত্রাসী কর্মসূচি মেনে নেওয়া যায় না।

আমরা ভেবে পাই না 'সন্ত্রাসী' শিক্ষকদের সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী আলোচনায় বসলেন কীভাবে? এসব শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনায় বসে শিক্ষামন্ত্রীও কি পরোক্ষভাবে তাঁদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে স্বীকৃতি দেননি? অফিসের মধ্যে কাউকে তিন-চার দিন অবরুদ্ধ করে রাখা কি 'আন্দোলন'?

অনেকে বলতে পারেন, বাংলাদেশের সার্বিক অব্যবস্থা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির তুলনায় জাবির এই ঘটনা অতি নগণ্য। আমরা এ ব্যাপারে একমত। তবে এটা ঘটেছে দেশের সবচেয়ে শিক্ষিত সমাজে। কোনো কারখানা বা বস্তিতে নয়। এমনকি ছাত্রদের মধ্যেও নয়। এ জন্যই এই ঘটনার একটা বিহিত হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা অনেক বিষয় সমাধান করি না। অনেক অপরাধীকে শাস্তি দিই না নানা অজুহাতে। রাজনৈতিক পক্ষপাতও আমাদের অসহায় করে রেখেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় জাবির এই ছোট ঘটনার শাস্তি দিয়ে একটা বড় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে। তাহলে অন্তত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে কিছুটা নিয়মনীতির চর্চা হতে পারে। রাজনৈতিক পক্ষপাত ও আন্দোলনের অজুহাতে আমরা অনেকেই সীমা অতিক্রম করে চলেছি। এর একটা বিহিত হওয়া দরকার।

● **মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর**: মিডিয়া ও উন্নয়নকর্মী।